**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী**

**ও মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা উপলক্ষে বিশেষ ফিচার**

**বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তন যদি না হতো**

সুভাষ সিংহ রায়

 এটা একটা বড় প্রশ্ন, ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু যদি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন না করতেন কী অবস্থা দাঁড়াত। কৃষি ধ্বংস হওয়ায় ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে ৪০ লাখ টন খাদ্য ঘাটতি হয়। এমনই সংকটময় পরিস্থিতিতে আমাদের ৯০ হাজার পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দি, আটক ৩৭ হাজার রাজাকার ও সোয়া লাখ ভারতীয় সৈন্যের খাদ্য সরবরাহের এক কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হয়। বঙ্গবন্ধু মাত্র ১ হাজার ৩১৪ দিন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশকে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে গেছেন। ফলে ১ লাখ ৬৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি সরকারি হয়। আর্থিক সংকট থাকা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু সরকার পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সব শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ ও অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধু শিক্ষকদের ৯ মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ ও ৯০০ কলেজ ভবন ও ৪০০ হাই স্কুল ভবন পুনর্নির্মাণ করেন। বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বছরে ৭ শতাংশেরও বেশি অর্জিত হয়েছিল। তিনি ১১ হাজার কোটি টাকার ধ্বংসস্তূপের ওপর আরও ১৩ হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন স্তম্ভ দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

 ১২ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে নির্ধারিত হয় জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত, রণসংগীত, শরণার্থী পুনর্বাসন ও দেশের অভ্যন্তরে ৪৩ লাখ বাসগৃহ পুনর্নির্মাণে ত্রাণ কমিটির রূপরেখা প্রণয়ন, ভারতীয় সৈন্যদের দেশে ফেরত, মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন, শহিদ ও আহত মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের বিচারের জন্য ‘বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) অধ্যাদেশ’ প্রণয়ন, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, ধ্বংসপ্রাপ্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনর্গঠন বা পুনর্নির্মাণ, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা, কৃষি পুনর্বাসন, ১৩৯টি দেশের স্বীকৃতি অর্জন, সংবিধান প্রণয়ন, প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাসের উদ্যোগ, আন্তর্জাতিক অনুদানপ্রাপ্তির কূটনীতি, মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রসমর্পণ, ব্যাংক বীমা সংস্কার, পাট ও বস্ত্রকল জাতীয়করণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু, ১৯৭১ সালের মার্চ-ডিসেম্বরকালীন ছাত্র বেতন মওকুফ, প্রাথমিক স্কুল জাতীয়করণ, ড. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন, পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ঘোষণা, বাজেটে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ, ধ্বংস হওয়া স্কুল-কলেজে নির্মাণসামগ্রী সরবরাহ, শিক্ষকদের ৯ মাসের বন্ধ বেতন দেওয়া, জরুরিভাবে ১৫০টি আইন প্রণয়ন, কৃষকদের (২৫ বিঘা পর্যন্ত) খাজনা মওকুফ, পরিত্যক্ত সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়ন, রেসকোর্স ময়দানে মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণের ঘোষণা।

 বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালে আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন প্রণয়ন করেছিলেন, যা ছিল অনন্য সাধারণ উদাহরণ। কেননা জাতিসংঘ এই আইন করেছিল ১৯৮২ সালে। উল্লেখ্য ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের আইনজ্ঞরা যখন মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারের জন্য বিশেষ আইন প্রণয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন, তখন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রসিয়াসের এই গ্রন্থটি জেনেভা থেকে এনে তাদের দিয়েছিলেন। অপরাধীদের যাতে সুষ্ঠু বিচার হয় সে জন্য বঙ্গবন্ধু সরকার সীমিত সম্পদ সত্ত্বেও নাম করা তরুণ ও প্রবীণ আইনজীবীদের বিচারের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। তিনি সবিতা রঞ্জন পাল (এসআর পাল নামে খ্যাত) ও সিরাজুল হককে চিফ প্রসিকিউটর নিযুক্ত করেছিলেন। তাদের সহায়তা করার জন্য ছিলেন আমিনুল হক, মাহমুদুল ইসলাম, ইসমাইল উদ্দিন সরকার ও আবদুল ওয়াদুদ ভুঁইয়া। তাদের অনেকে পরবর্তীকালে অ্যাটর্নি জেনারেল ও বিচারক হয়েছিলেন। পুলিশের ডিআইজি নুরুল ইসলাম ছিলেন প্রধান তদন্ত কর্মকর্তা।

 ১৯৭২ সালের দালাল আদেশ ২৬ মার্চ ১৯৭১ থেকেই কার্যকর হওয়ার আইনি নির্দেশনা থাকায় দেশব্যাপী দালাল আটক অভিযান শুরু হয় এবং ১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত রাজাকার, আলবদর, আলশামস ও শান্তি কমিটির ৩৭ হাজার ৪৭১ জনকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ২৬ হাজার ৮৩৫ জনকে পাকিস্তানি বাহিনীকে সহায়তার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে আটক করা হয়। এতসব আইনগত বিধান, ছাড় ও ক্ষমতা দেওয়া সত্ত্বেও গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত মাত্র ২ হাজার ৮৪৮টি মামলার নিষ্পত্তি হয়। দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছিল ৭৫২ জন। এর মধ্যে ১৯ জনের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়। অর্থাৎ অভিযোগকৃত ও গ্রেফাতারকৃত ব্যক্তিদের তিন-চতুর্থাংশই অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল। যদিও সরকার আইনগত ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে ৭৩টি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছিল। তারপরও ২২ মাসে ২ হাজার ৮৪৮টি মামলার বিচারকাজ সম্পন্ন হলে মাসে ১৩০টি এবং দিনে ৩-৪টি মামলার বেশি বিচার নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

-২-

 আশ্চর্য সাবলীলতায় সহস্র প্রতিকূলতার মধ্যে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি শেষ হতে না হতেই প্রায় ৫০টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিশ্বদরবারে বাংলাদেশের স্বীকৃতির পথ সুগম করে দিল। ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে, ততদিনে বাংলাদেশ ১২০টি দেশের স্বীকৃতি লাভ করেছে। এসবই সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছিলেন বলেই। বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় আমরা চীন ও সৌদি আরব ছাড়া বিশে^র সব দেশেরই স্বীকৃতি লাভ করেছিলাম। ১৯৭১ সালে ৯ মাস কারাবাসকালে বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন তার বিচারের প্রহসন-মৃত্যুদণ্ড। পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালি জেলে অবস্থানকালে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেখানে তার কবর খোঁড়ার আয়োজন। বহু বছর কারাবাসের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শেখ মুজিব জেলে বসেই স্থাপন করেছিলেন জেলের ডিআইজি শেখ আবদুর রশিদের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক।

 এলো ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। আমাদের বিজয় দিবস। বাংলাদেশে পরাজিত জেনারেল নিয়াজির বাড়িও মিয়াওয়ালিতে। সেখানেই কারাগারে রয়েছেন বঙ্গবন্ধু। পাকিস্তানের পরাজয়ের কোনো হিংসাত্মক প্রতিক্রিয়া যদি মিয়ানওয়ালি জেলে ঘটে, সেই ভয়ে শেখ রশিদ বঙ্গবন্ধুকে স্থানান্তরিত করলেন তার বাসস্থানে। অন্তরীণ অবস্থাতেই। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তিলাভের মুহূর্ত থেকেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের গৌরবজনক আসন প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু ছিলেন সচেষ্ট। ৮ জানুয়ারি ১৯৭২, রাওয়ালপিন্ডি থেকে লন্ডনে পদার্পণের পর থেকে ১০ জানুয়ারি ঢাকায় তার জনসভায় ভাষণদান পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান ছিল মাত্র ৫০ ঘণ্টার কিছু বেশি। কিন্তু সে-সময়টুকুর মধ্যে বন্দিত্ব থেকে মুক্তির আস্বাদ লাভের সেই প্রথম প্রহরগুলোতে আন্তর্জাতিক সমাজে বাংলাদেশকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর কর্মকাণ্ডের বিবরণ আগ্রহ-উদ্দীপক। কারণ, সেই আবেগপূর্ণ সময়টির মধ্যেও এক আশ্চর্য সাবলীলতায় তিনি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির কাঠামোর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে সক্ষম হয়েছিলেন।

 ১০ জানুয়ারি ১৯৭২, বঙ্গবন্ধুর দিল্লি পৌঁছানোর সেই স্মরণীয় প্রভাতে মুজিব আর ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে হয়েছিল পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। তিনি ঢাকার রেসকোর্সের সেই সভায় ঘোষণা করেছিলেন, “তাঁর (ইন্দিরা গান্ধী) সঙ্গে আমি দিল্লিতে পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করেছি। আমি যখনই চাইব ভারত বাংলাদেশ থেকে তার সৈন্যবাহিনী ফিরিয়ে নেবে।” তার দু-মাসের মধ্যেই ১২ মার্চ ১৯৭২, ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ থেকে শেষ ভারতীয় সৈন্যদের বিদায় ছিল সমতার ভিত্তিতে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

 ৮ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে লন্ডনে পৌঁছেই সংবাদ সম্মেলনে দেওয়া বিবৃতিতে বিশ^বাসীর কাছে বঙ্গবন্ধু জানান দুটি আবেদন- ‘বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করুন’ আর ‘আমার ক্ষুধার্ত কোটি প্রাণের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসুন’। ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী অ্যাডওয়ার্ড হিথের সঙ্গে তার সেদিন হয়েছিল ঘণ্টাব্যাপী সাক্ষাৎ। তিনি সেই সাক্ষাতে বাংলাদেশকে যথাসম্ভব শিগগির স্বীকৃতি ও সাহায্য প্রদানের জন্য ইংল্যান্ডের প্রতি আবেদন জানিয়েছিলেন। এপ্রিল ১৯৭২, বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভ করেছিল।

 বঙ্গবন্ধু স্বীকৃতি-ভিক্ষায় কোনো দেশে যাননি কখনও। ১৯৭২ সালে তিনি লন্ডনে তার অস্ত্রোপচারের পর জেনেভায় ছিলেন দ্রুত আরোগ্যের পথে। মিসরের রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সাদাত তাকে সেখানে বাংলাদেশে ফেরার পথে কায়রো সফরের জন্য জানালেন আমন্ত্রণ। কিন্তু মিসর তখনও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। তবু সাদাত জানালেন যে কায়রোতে তিনি বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় স্বাগত জানাবেন আর বাংলাদেশকে তখনই প্রদান করবেন স্বীকৃতি। মনে পড়ে, স্বীকৃতি কামনায় কারও কাছে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে যাওয়াকে বঙ্গবন্ধু অশোভন বিবেচনা করেছিলেন। তার শরীরের অবস্থা উল্লেখ করে মিসর সফরের অপারগতা তিনি কূটনৈতিক ভাষায় রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সাদাতকে জানিয়েছিলেন। তার দুই বছর পর ১৯৭৪ সালে রাষ্ট্রপতি সাদাতই প্রথম বাংলাদেশ সফর করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু তারপরই গিয়েছিলেন ফিরতি রাষ্ট্রীয় সফরে মিসর। দেশের সম্মান রক্ষায় আপসহীন ছিলেন রাষ্ট্রনায়ক শেখ মুজিব।

 অটোয়াতে ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু গিয়েছিলেন কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিতে। তখনও নাইজেরিয়া আমাদের স্বীকৃতি দেয়নি। সাংবাদিকদের একটি অনুষ্ঠানে নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রপতি ইয়াকুবু গাওয়ানের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর দেখা। সাদা পায়জামা পাঞ্জাবি, কালো মুজিবকোট আর চাদর পরিহিত বঙ্গবন্ধু ছিলেন সেই অভ্যর্র্থনাসভার সবচেয়ে দৃষ্টিকাড়া রাষ্ট্রনায়ক। তার চারপাশে অনেক বিদেশি সাংবাদিক। হঠাৎ দেখলাম তিন পিস ধোপদুরন্ত স্যুট পরিহিত জেনারেল ইয়াকুবু গাওয়ান এগিয়ে আসছেন বঙ্গবন্ধুর দিকে। তিনি সম্ভাষণ জানালেন বঙ্গবন্ধুকে। তারপরে করলেন অপ্রত্যাশিত একটি প্রশ্ন।

-৩-

বললেন, “আচ্ছা প্রধানমন্ত্রী, বলুন তো, অবিভক্ত পাকিস্তান ছিল একটি শক্তিশালী দেশ। সেই দেশটিকে কেন আপনি ভেঙে দিতে গেলেন?” আমরা জানতাম যে নাইজেরিয়ার সে-সময়কার বিচ্ছিন্নতাবাদী বিয়াফ্রা আন্দোলন ছিল গাওয়ানের দুশ্চিন্তার কারণ। বাংলাদেশের সফল সংগ্রাম থেকে বিয়াফ্রাবাসী অনুপ্রেরণা পেতে পারে সেই ভয় তার ছিল। তবু একজন রাষ্ট্রনায়কের কাছ থেকে অন্য একজন রাষ্ট্রনায়কের প্রতি এ ধরনের প্রশ্ন প্রত্যাশিত নয় মোটেও। তার স্বভাবসিদ্ধ উচ্চহাসিতে চারপাশের অবাক নীরবতা ভাঙালেন বঙ্গবন্ধু। তারপর গম্ভীর তর্জনী-সংকেতে বললেন, “শুনুন মহামান্য রাষ্ট্রপতি, আপনার কথাই হয়তো ঠিক। অবিভক্ত পাকিস্তান তো শক্তিশালী ছিল, তার চেয়েও শক্তিশালী হয়তো হতো অবিভক্ত ভারত। তার চেয়েও শক্তিশালী হতো সংঘবদ্ধ এশিয়া, আর মহাশক্তিশালী হতো একজোট এই বিশ^টি। কিন্তু মহামান্য রাষ্ট্রপতি, সবকিছু চাইলেই কি পাওয়া যায়?” কথাটি বলেই তার গলার সাদা চাদরটি হাতে নিলেন বঙ্গবন্ধু। তুলে দিলেন হতবাক নিশ্চুপ প্রেসিডেন্ট গাওয়ানের হাতে। বললেন, “এই নিন বাংলাদেশের জনগণের তরফ থেকে আমার ক্ষুদ্র উপহার।” কুশলী কূটনীতিবিদ শেখ মুজিব। ১৩৬তম দেশ হিসাবে জাতিসংঘের সদস্যপদ পায় বাংলাদেশ। যদিও এই প্রাপ্তির পথটা ছিল ভীষণ জটিলতায় পরিপূর্ণ। মূলত সেটিই ছিল বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে প্রধান চ্যালেঞ্জ। জুলফিকার আলী ভুট্টোর সময়ে পাকিস্তানের প্ররোচনায় নিরাপত্তা পরিষদে চীনের ভেটো প্রয়োগের কারণে পরপর দুবার জাতিসংঘের সদস্য হতে ব্যর্থ হয় বাংলাদেশ। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য চীন বাংলাদেশকে প্রথমত আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়নি; কিন্তু তা সত্ত্বেও অনানুষ্ঠানিকভাবে সেদেশের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সরকার সম্প্রীতিমূলক সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছিলেন, যার জন্য চীনের ‘ভেটো’ প্রত্যাহার করিয়ে বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর সদস্যপদ লাভ করে। সেটিই মূলত বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক মর্যাদার বিজয়ের স্বীকৃতি। যেহেতু সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি, তাই বাংলাদেশের নাগরিকদের হজব্রত পালন করতেও বাধা এসেছিল।

 আলজেরীয় মুক্তি সংগ্রামের নেতা কর্নেল হোয়ারি বুমেদিয়ান ছিলেন বঙ্গবন্ধুর বিশেষ ভক্ত; তার মধ্যস্থতায় বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাপনায় হজের ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৯৭৪ সালে বন্যায় সৌদি আরব আমাদের দিয়েছিল ১০ মিলিয়ন ডলারের অনুদান। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রক্ষায় বঙ্গবন্ধু ছিলেন তৎপর ও দূরদর্শী। ১৯৭৪ সালের শেষার্র্ধ্বে বঙ্গবন্ধুর কুয়েত ও সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর এই অঞ্চলে বাংলাদেশিদের কর্ম লাভের সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। ১৯৭৪ সালের প্রথমার্ধ্বে বঙ্গবন্ধুর দিল্লি সফরকালে ভারতের সঙ্গে আমাদের সীমান্ত চুক্তি সম্পাদিত হয়। ১৯৭৫ সালের প্রারম্ভেই শুরু হয়েছিল দুদেশের মধ্যে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের প্রক্রিয়া। ফারাক্কার পানি বণ্টনে বঙ্গবন্ধুর সরকার শুষ্ক মৌসুমে পেয়েছিল ৪৪ হাজার কিউসেক পানির নিশ্চয়তা। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর তা গিয়ে ঠেকেছিল ১৩ হাজার কিউসেক পানিতে।

 আজ ২০২০ সালের ১০ জানুয়ারির সময় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ৩২-৩৩ বিলিয়ন ডলার মজুদ আছে। হয়তো এই খবর অনেকের কাছে নেই- কীভাবে শুরু হয়েছিল আমাদের রাষ্ট্রীয় কোষাগার। কানাডা সরকার তখন বঙ্গবন্ধুকে আড়াই মিলিয়ন ডলারের স্বর্ণে একটি উপহার দেয়। সেটাই রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিয়ে শুরু করা হয় বাংলাদেশ ব্যাংক। যে রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধু সমগ্র বাঙালি জাতিকে সর্বাত্মক যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেছিলেন, সেই বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি খুব স্পষ্ট করে বলেছিলেন, “গত ৯ মাসে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী বাংলাকে বিরান করেছে। বাংলার লাখো মানুষের আজ খাবার নাই, অসংখ্য লোক গৃহহারা। এদের জন্য মানবতার খাতিরে আমরা সাহায্য চাই। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের প্রতি আমি সাহায্যের আবেদন জানাই। বিশ্বের সকল মুক্ত রাষ্ট্রকে অনুরোধ করছি, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন।”

 ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর থেকে এদেশের মানুষ শুধু ইতিহাস দখলের ইতিহাস দেখেছে। দীর্ঘ সংগ্রামের ফলে যে বাংলাদেশের জন্ম হয়, তার হত্যাকাণ্ডে জাতিগত সব অর্জন ভূলুণ্ঠিত হয়ে গেল। তিনি বেঁচে থাকলে বাংলাদেশ অনেক আগেই মালয়েশিয়া কিংবা সিঙ্গাপুরের মতো অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জায়গায় দাঁড়িয়ে যেত। বঙ্গবন্ধু অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মর্যাদাবান জাতিতে পরিণত করতে পেরেছিলেন। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারির পর অর্থনৈতিক মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বে তিনি ছিলেন এক ও অদ্বিতীয়। তিনি দেশে ফিরে না এলে অর্থনৈতিক মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার কেউ ছিলেন না। বঙ্গবন্ধু স্বদেশে এসেছিলেন বলেই ভারতীয় সৈন্য দ্রুততম সময়ে প্রত্যাবর্তন করেছিল। পৃথিবীর কোনো দেশের স্বাধীনতার পর এত কম সময়ে মিত্রশক্তি দেশ ছাড়ে না।

-৪-

 এই মহামানুষটা দেশে প্রত্যাবর্তন না করলে গোটা পৃথিবী বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াত না। কেননা বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি ছিল খুবই স্বচ্ছ ও স্পষ্ট। যুদ্ধ শেষের দিনগুলোতে পাকিস্তানি ব্যবসায়ীরা সর্বশেষ কড়িটিও পশ্চিমে নিয়ে যায়। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কাছে পাওনা আদায়ের ব্যাপারে ভীষণ রকমের তৎপর ছিলেন। ১৯৭৫ সালে কমনওয়েলথ রাষ্ট্রের প্রধানদের কনফারেন্সেও তিনি এই ইস্যু উত্থাপন করেন। এমন কী ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে ইসলামি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনেও প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়।

 ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন হলো আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। কিন্তু জাতিসংঘের সদস্য হতে চার বছর তার লেগে গেল কেন? চীন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সৈন্যদের অস্ত্র, গুলি আর রাইফেল দিয়েছিল। চীনের বাধার কারণেই জাতিসংঘের যে সদস্যপদ আমরা ১৯৭২ সালেই পেতে পারতাম, তা পেতে ১৯৭৪ সাল লেগে গেল। বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের ঐতিহাসিক সেই বক্তৃতা মঞ্চটিতে আরোহণ করলেন ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪। বঙ্গবন্ধু ছিলেন এই অধিবেশনে প্রথম এশীয় নেতা, যিনি এই অধিবেশনের সবার আগে বক্তৃতা করেন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, “আজকের দিনে জাতিসংঘ কোন পথ বেছে নেবে? ধ্বংসের পথ না-কি ক্ষুধা দূর করার পথ!” তিনি বাংলাদেশের সেই সময়ের প্রবল বন্যার কথা বললেন। সবশেষে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, “মানুষের অসম্ভবকে জয় করার ক্ষমতা ও অজেয়কে জয় করার শক্তির প্রতি বিশ্বাস রেখে বক্তৃতা শেষ করতে চাই। আমরা দুঃখ ভোগ করতে পারি, কিন্তু মরব না।” আমরা কি কখনও ভাবি বঙ্গবন্ধু যদি দেশে না ফিরতেন, তাহলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াতাম? বাঙালি জাতির সৌভাগ্য বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রতিনিয়ত লড়াই করছেন এবং এ জন্যই বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। আজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরিচয়ে বাংলাদেশ সারাবিশে^ পরিচিত হচ্ছে। তিনি এখন একজন বিশ্বনেতা। যুক্তরাষ্ট্রের টাইম কর্পোরেশনের বাণিজ্য বিষয়ক ম্যাগাজিন ‘ফরচুন’-এর জরিপে বিশে^র শীর্ষ ১০ নেতার তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন বঙ্গবন্ধু-সুকন্যা শেখ হাসিনা। নিউইয়র্কভিত্তিক সাপ্তাহিক ‘টাইম’ ম্যাগাজিনে ২০১৮ সালে বিশ্বের ১০০ প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে’র সাথে অন্তর্ভুক্ত হন আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সবকিছু সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারিতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছিলেন বলেই।

#

০৮.০১.২০২০ পিআইডি ফিচার

সুভাষ সিংহ রায় : রাজনৈতিক বিশ্লেষক